بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩১ মার্চ, ২০২৩ মোতাবেক ৩১ আমান, ১৪০২ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বর্তমানে আমরা রমযান মাস অতিক্রম করছি। এটি এমন এক মাস যে মাসে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজ করে আর মু'মিনদের জামাতে এই পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া উচিত। এই মাসে রোযার পাশাপাশি ইবাদতের প্রতিও অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এবং হওয়া উচিত। পবিত্র কুরআন পাঠ করা ও শোনার প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। যদি রোযার প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে হয় তাহলে ইবাদতের পাশাপাশি পবিত্র কুরআন পাঠ করা ও শোনার প্রতিও অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। এছাড়া রমযানের পবিত্র কুরআনের সাথে বিশেষ সম্পর্ক আছে বা কুরআনের রমযানের সাথে (বিশেষ) সম্পর্ক রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (সূরা আল্ বাকারা: ১৮৬)। রমযান সেই মাস যাতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। সেই কুরআন যা সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য হেদায়াতরূপে প্রেরণ করা হয়েছে যা নিজের মাঝে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ধারণ করে, যা সঠিক পথের দিশা দেয় এবং তা ঐশী নিদর্শনাবলীও বটে। কতক নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত অনুসারে, ২৪ রমযানে মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহী (অবতীর্ণ) হয়। একইভাবে প্রত্যেক বছর মহানবী (সা.)-এর সাথে জিব্রাইল (আ.) রমযানে পবিত্র কুরআনের একটি দওর সম্পন্ন করতেন বা একবার খতম দিতেন এবং (তাঁর জীবনের) শেষ বছরে দুবার এই পাঠ সম্পন্ন হয়। যাহোক, রমযানের প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআনের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

অতএব, আমাদেরকেও এই মাসে বিশেষভাবে পবিত্র কুরআন পাঠ ও শ্রবণ, এর তফসীর পাঠ ও শ্রবণের প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। এমটিএ'তেও এ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান প্রচার হয়, দরসও প্রচারিত হয়, এর প্রতিও মনোযোগ দিন। আমরা যখন পবিত্র কুরআন পাঠের পাশাপাশি এর অনুবাদ ও তফসীর পড়ব এবং শুনব, তখনই আমরা সেসব আদেশ-নিষেধের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারব যা এতে বর্ণিত হয়েছে, এগুলোকে নিজের জীবনের অংশে পরিণত করতে পারব, নিজেদের জীবনকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী গড়তে পারব এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণকারী হতে পারব।

অতএব, আমাদেরকে যদি রমযানের সত্যিকার কল্যাণ লাভ করতে হয় তাহলে আমাদের পবিত্র কুরআন পাঠ এবং এর প্রতি অভিনিবেশ করার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া উচিত। যেসব স্থানে মসজিদে দরসের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে দরস শোনা উচিত। পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব, এর সৌন্দর্যাবলী এবং এর সমুজ্জল দলিল-প্রমাণের বিষয়ে এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খুব স্পষ্টভাবে আমাদেরকে অবহিত করেছেন। কিছুদিন থেকে বিভিন্ন খুতবায় আমি হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে এগুলো বর্ণনা করে আসছি। তাই এগুলো বারবার শোনা, পাঠ করা ও এগুলোর প্রতি অভিনিবেশ করা প্রয়োজন, যেন আমরা সঠিকভাবে জ্ঞান ও বুৎপত্তি অর্জন করতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্যের আলোকে আজও আমি কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। পবিত্র কুরআন চিরস্থায়ী শরীয়ত– এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদা তা'লার প্রজ্ঞা ও আদেশ-নিষেধ দুধরনের হয়ে থাকে। কতেক স্থায়ী এবং চিরকালীন আর কতেক সাময়িক এবং সময়ের চাহিদার নিরিখে কার্যকর হয়ে থাকে। যদিও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সেগুলোর মাঝেও স্থায়িত্ব রয়েছে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী হলেও প্রকৃতপক্ষে তা স্থায়ী (নির্দেশনা) কিন্তু সেগুলো সাময়িক-ই হয়ে থাকে; উদাহরণস্বরূপ সফরে নামায বা রোযা সংক্রান্ত নির্দেশনা এক রকম এবং মুক্বিম (বা নিজের জায়গায় অবস্থানের) ক্ষেত্রে ভিন্ন, অর্থাৎ সফরকালে নামায জমা করার অথবা কসর (সংক্ষিপ্ত) করার বিষয়ে অনুমতি রয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায় নামায সম্পূর্ণ পড়া উচিত। অনুরূপভাবে সফরে রোযা সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে। সাধারণ অবস্থায়, মুক্বিম অবস্থায় প্রত্যেক সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা ফরয। এরপর তিনি (আ.) বলেন, উদাহরণস্বরূপ আরেকটি আদেশ হলো, মহিলা যেন (বাড়ির) বাইরে যাওয়ার সময় বোরকা পরে বের হয়। এটি এমন একটি আদেশ যা নারীর জন্য বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য। বাড়িতে বোরকা পরিধান করে ঘুরে বেড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। পর্দার আদেশ বাড়ির বাইরে প্রযোজ্য। এরপর এবিষয়টি রয়েছে যে, কাদের সাথে পর্দা করতে হবে এবং কাদের সাথে নয়।

তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বলছেন যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের আদেশাবলী সাময়িক আর সাময়িক প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে ছিল। আর মহানবী (সা.) যে শরীয়ত এবং গ্রন্থ নিয়ে এসেছিলেন সেই গ্রন্থ হলো চিরস্থায়ী ও চিরন্তন শরীয়ত। তাই এতে বর্ণিত সবকিছু পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ। পবিত্র কুরআন চিরস্থায়ী বিধান, অপরদিকে পবিত্র কুরআন যদি না-ও আসত তাহলেও তওরাত ও ইঞ্জিল মনসুখ (রহিত) হয়ে যেত, কেননা সেগুলো চিরস্থায়ী ও চিরন্তন শরীয়ত ছিল না।

অতএব পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব, পবিত্র কুরআনের পথনির্দেশনা সকল পরিস্থিতি ও অবস্থার দাবি পূরণ করে, অত্যন্ত পরিপূর্ণ এবং সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, পর্দার যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি আপত্তিকারীরা এ সম্পর্কেও আপত্তি করে বসে যে, বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে পর্দা আবশ্যক নয়। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরাও এদের কথায় প্রভাবান্বিত হয়, কিন্তু এরা স্বয়ং এ কথা অকপটে স্বীকারও করছে আর এ সম্পর্কে বড় বড় প্রবন্ধও রচনা করে। আজকাল নারীদের সংগঠনগুলোও আন্দোলন আরম্ভ করেছে। অনেক সময় পত্রপত্রিকাতেও এসব সংবাদ প্রকাশিত হয়। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা কখনো কখনো কুৎসিত অবস্থার অবতারণা করছে আর তাই এখন অনেকে চিন্তা-ভাবনাও করছে যে, (পুরুষ-মহিলার অনুষ্ঠানের পৃথক পৃথক) ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

অতঃপর নিজের আগমনের উদ্দেশ্য এবং চিরন্তন শরীয়ত হিসেবে কুরআন সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো বলেন, এ কথাও মনোযোগ দিয়ে শোনো! আমার আবির্ভাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? আমার আগমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো কেবল ইসলামের সংস্কার ও সমর্থন। এর অর্থ এমনটি করা উচিত নয় যে, আমি নতুন কোনো শরীয়ত শেখাতে অথবা নতুন আদেশ প্রদানের জন্য এসেছি কিংবা নতুন

কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে। কক্ষনো না! যদি কেউ এমনটি মনে করে তাহলে আমার দৃষ্টিতে সে চরম পথভ্রষ্ট এবং বেদ্বীন। মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে শরীয়ত এবং নবুয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে। এখন আর কোনো (নতুন) শরীয়ত আসতে পারে না। পবিত্র কুরআন খাতামুল কুতুব, এখন এতে তিল পরিমাণ বা বিন্দুবিসর্গও সংযোজন-বিয়োজনের কোনো অবকাশ নেই। তবে হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, মহানবী (সা.)-এর আশিস ও কল্যাণরাজি আর পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং হেদায়াতের সুফল ফুরিয়ে যায় নি। তা সকল যুগে তরতাজারূপে বিদ্যমান এবং সেই কল্যাণরাজি ও আশিসমালার প্রমাণ দেয়ার জন্যই খোদা তা'লা আমাকে দণ্ডায়মান করেছেন। অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষা সবাই অনুধাবন করতে পারে না। কতক বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এবং তফসীরের দাবি রাখে, যেগুলো বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা এই শেষ যুগে আমাকে প্রেরণ করেছেন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফ এমন এক মু'জিযা যার কোনো দৃষ্টান্ত পূর্বেও ছিল না এবং পরবর্তীতেও হবে না। অর্থাৎ পূর্বাপর এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এর আশিস এবং কল্যাণের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত আর তা সকল যুগে তেমনই সুস্পষ্ট ও সমুজ্জল যেভাবে মহানবী (সা.)-এর যুগে ছিল। এছাড়া একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কথা তার যোগ্যতা ও দৃঢ়চিত্ততা অনুযায়ী হয়ে থাকে। তার দৃঢ়তা, সংকল্প এবং উদ্দেশ্য যত উন্নত মানের হবে তার বাণীও সেই একই মানের হবে। অতএব ঐশী বাণীর মাঝেও একই বৈশিষ্ট্য থাকবে। সাধারণ মানুষ যেমন তার জ্ঞান অনুযায়ী কথা বলে থাকে, তেমনি ঐশীবাণীর একটি মর্যাদা রয়েছে। যে ব্যক্তির প্রতি খোদার ওহী অবতীর্ণ হয় সে যতটা দৃঢ়চিত্ত হবে সেই মানের বাণী সে লাভ করবে। এক্ষেত্রেও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ওহীরও বিভিন্ন মান রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার বাণীরও বিভিন্ন মান রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর দৃঢ়চিত্ততা, শক্তিসামর্থ্য ও সংকল্পের গণ্ডি যেহেতু অনেক বিস্তৃত ছিল তাই তিনি যে বাণী লাভ করেছেন তা-ও এমন উন্নত মর্যাদার যে, অন্য কোনো ব্যক্তি এরূপ মনোবল ও দৃঢ়তাসহ কখনো জন্ম গ্রহণ করবে না। অতঃপর তিনি (আ.) বলেন,

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার গণ্ডি অনেক বিস্তৃত, তা কেয়ামত পর্যন্ত একটি অপরিবর্তনশীল আইন এবং সকল জাতি ও সর্বকালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব খোদা তা'লা বলেন, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (সূরা আল্ হিজর: ২২) অর্থাৎ, আমরা আমাদের ভাণ্ডার থেকে একটি নির্ধারিত পরিমাণে অবতীর্ণ করে থাকি। তিনি (আ.) বলেন, ইঞ্জিলের প্রয়োজন কেবল ততটুকুই ছিল, তাই ইঞ্জিলের সারাংশ কেবল এক পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা সম্ভব। পক্ষান্তরে কুরআন করীমের প্রয়োজন দেখা দেয় সকল যুগের সংশোধনের নিমিত্তে, অর্থাৎ সব যুগের (মানুষের) সংশোধন করা। কুরআন করীমের উদ্দেশ্য ছিল বন্য অবস্থা থেকে মানুষে পরিণত করা, মানবীয় সাধারণ আচরণের উত্তরণ ঘটিয়ে সুসভ্য মানুষ বানানো যেন শরীয়তের সীমারেখা ও নির্দেশাবলী পালনের মাধ্যমে বিষয়ের সমাধা হয়, আর এরপর (তাদেরকে) খোদাপ্রেমী মানুষ বানানো। যদিও শব্দ খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু এর হাজার হাজার শাখাপ্রশাখা রয়েছে। যেহেতু ইহুদি, প্রকৃতিবাদী, অগ্নিপূজারি এবং বিভিন্ন জাতির মাঝে নানান কুসংস্কারের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল তাই মহানবী (সা.) ঐশী জ্ঞানের আলোকে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার

পক্ষ থেকে তাঁকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে সে অনুযায়ী সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (সূরা আল্ আরাফ: ১৫৯) অর্থাৎ তুমি বলে দাও, হে মানব সকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল। এজন্য কুরআন করীম সেসব শিক্ষামালার সমষ্টি হওয়া আবশ্যক ছিল যা বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে আর সেই সমস্ত সত্যতা নিজের মাঝে ধারণ করা (আবশ্যক ছিল) যা আকাশ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে জগদ্বাসীকে পৌঁছানো হয়েছিল। অর্থাৎ অবস্থা অনুযায়ী পুরোনো যে শিক্ষামালা ছিল সেগুলোও পবিত্র কুরআন নিজের মাঝে ধারণ করা (আবশ্যক ছিল), আর এগুলো পবিত্র কুরআনে রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, আর কুরআন করীমের সামনে ছিল সমগ্র মানবজাতি, কোনো বিশেষ জাতি, দেশ বা সময় নয়। পক্ষান্তরে ইঞ্জিলের দৃষ্টি ছিল একটি বিশেষ জাতির প্রতি। তাই মসীহ্ (আ.) বারংবার বলেছেন, আমি ইসরাঈল জাতির হারানো মেষের সন্ধানে এসেছি।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে মহানবী (সা.)-এর এই ঘোষণা যে, আমি সমগ্র বিশ্বের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌র রসূল– এটি একথারও প্রমাণ যে, কুরআন করীম গোটা জগতের জন্য হেদায়েতের মাধ্যম। প্রাচীন জাতিসমূহের জন্যও ছিল, তাদের অবস্থা অনুযায়ী তাদেরকে অবহিত করেছে এবং নতুন আগমনকারীদের জন্যও এতে নির্দেশাবলী রয়েছে। আর এটিই এক চিরস্থায়ী শরীয়ত এবং এটি ছাড়া আর কোনো শরীয়ত নেই যা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

কুরআন শরীফ সমগ্র শিক্ষার জ্ঞানভাণ্ডার– একথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফ হচ্ছে প্রজ্ঞা ও চিরস্থায়ী শরীয়ত এবং সকল প্রকার শিক্ষার ভাণ্ডার। আর এভাবে কুরআন শরীফের প্রথম নিদর্শন হচ্ছে এর সুমহান শিক্ষা এবং দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ। যেমন সূরা ফাতেহা, সূরা তাহ্‌রীম ও সূরা নূর-এ কীরূপ মহান ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে! রসূলে করীম (সা.)-এর পুরো মক্কী জীবন ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ণ। এগুলোর প্রতি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যদি খোদাভীতির সাথে চিন্তা-ভাবনা করে তবে সে বুঝতে পারবে যে, কী পরিমাণ অদৃশ্যের সংবাদ মহানবী (সা.) লাভ করেছিলেন। যখন সমস্ত জাতি তাঁর (সা.) বিরোধী ছিল এবং কোনো সহমর্মী ও বন্ধু ছিল না, সেই সময় একথা বলা যে, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (সূরা আল্ ক্বমর: ৪৬) কোনো ছোট বিষয় হতে পারে কি? অর্থাৎ অচিরেই সেই দলকে পরাভূত করা হবে এবং তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে- এটি হলো আয়াতের অর্থ। তিনি (আ.) বলেন, এটি কোনো তুচ্ছ বিষয় হতে পারে কি? উপায়উপকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে (অর্থাৎ যদি তা থাকে, তবে) এই কথা বলা যেতে পারে যে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি (সা.) এরূপ অবস্থায় নিজের সফলতা ও শত্রুপক্ষের লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার ভবিষ্যদ্বাণী করছেন (যখন বাহ্যত কোনো সাজসরঞ্জাম ছিল না) এবং পরিশেষে হুবহু এরূপই সংঘটিত হয়েছে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী যার উল্লেখ কুরআন করীমে রয়েছে তা মহানবী (সা.)-কে খোদা তা'লা মক্কায় প্রদান করেছিলেন আর সেটিও প্রাথমিক অবস্থায় যখন কিনা তিনি (সা.) মক্কায় অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। এরপর এই ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে? আমরা দেখতে পাই যে, আহযাবের

যুদ্ধের সময়, (সাধারণত এটিকে আহযাবের যুদ্ধের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর বাস্তবায়ন দেখা যায়;) যখন কিনা কাফেররা বড় সংখ্যায় মুসলমানদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছে। এরপর তিনি (আ.) বলেন, অতঃপর তেরোশ বছর পর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের এবং সে যুগের লক্ষণ ও নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বাণী কতই না মহান ও অুলনীয়! অর্থাৎ তিনি (আ.) বলেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী কতই না মহান! বিগত খুতবায় আমি এর কয়েকটি উল্লেখ করেছি যা এখনও কত মহিমার সাথে পরিপূর্ণতা লাভ করছে! তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীর যে কোনো গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপন করো। মসীহ্'র ভবিষ্যদ্বাণী এগুলোর মোকাবিলা করতে পারে কি?

কুরআনের প্রত্যেকটি নির্দেশের পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে– এ প্রেক্ষাপটে কুরআন করীমের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, এই বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র কুরআনের শিক্ষারই রয়েছে যে, এর প্রত্যেকটি নির্দেশ নিজের মাঝে উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা রাখে। অর্থাৎ এর লক্ষ্য ও একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আর এজন্য কুরআন করীমের বহু স্থানে এই নির্দেশনা রয়েছে যে, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রণিধান, বিচক্ষণতা ও ঈমানের সাথে যেন কাজ করা হয়। ফকাহত হলো বিচারবুদ্ধিকেও কাজে লাগাও আর ঈমানও কাজে লাগাও। ঈমানেরও প্রয়োজন রয়েছে। আর কুরআন মজীদ ও অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে এটিই পার্থক্য। অন্য কোনো গ্রন্থ নিজ শিক্ষাকে বিবেকবুদ্ধির সূক্ষ্ম ও স্বাধীন সমালোচনার মুখোমুখি করার সাহসই করে নি। তিনি (আ.) ইঞ্জিলের উদাহরণ প্রদানপূর্বক বলেন,

ইঞ্জিলের চতুর ও ধোঁকাবাজ পৃষ্ঠপোষকরা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, ইঞ্জিলের শিক্ষা যুক্তির বিচারে নিতান্ত প্রাণহীন, অত্যন্ত সতর্ককতার সাথে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে এই বিষয়টির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে যে, ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্তবাদ এমন রহস্যপূর্ণ বিষয় যে, মানুষের বিবেকবুদ্ধি এর গভীরতা উদঘাটনে অক্ষম। অত্যন্ত গভীর জ্ঞানের বিষয় যা পর্যন্ত তোমরা পৌঁছতে পারবে না। তাই যখন যেভাবে বলা হয় সেভাবে গ্রহণ করে নাও। কিন্তু এর বিপরীতে কুরআন করীমের শিক্ষা হলো, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ (সূরা আলে ইমরান: ১৯১-১৯২)

অর্থাৎ আকাশসমূহের সৃষ্টি ও পৃথিবীর সৃজন এবং রাত্রি ও দিবসের পালাবদল বুদ্ধিমান লোকদেরকে সেই খোদার স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করে যার দিকে ইসলাম ধর্ম আমন্ত্রণ জানায়। এই আয়াতে কতই না স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান যে, বুদ্ধিমানরা যেন নিজেদের বুদ্ধি ও মেধাকে কাজে লাগায়। (অতএব) চিন্তাভাবনা করো।

পবিত্র কুরআন একটি সংরক্ষিত পুস্তক এবং প্রকৃতির নিয়ম পবিত্র কুরআনের শিক্ষার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করে– এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে {হযরত মসীহ মওউদ (আ.)} বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (সূরা আল্ ওয়াকেয়া: ৭৮-৮০)

"নিশ্চয় এ এক সম্মানিত কুরআন। একটি গুপ্ত পুস্তক অর্থাৎ, এর মাঝে সুরক্ষিত বিষয় রয়েছে। পবিত্র ব্যক্তি ব্যতিত কেউ একে স্পর্শ করতে পারে না।" প্রকৃতপক্ষে এই সমগ্র গ্রন্থটি প্রকৃতির দৃঢ় সিন্দুকে সংরক্ষিত আছে। একথার অর্থ কী যে, পবিত্র কুরআন একটি গুপ্ত গ্রন্থে রয়েছে? অর্থ হলো, এর অস্তিত্ব শুধুমাত্র কাগজেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি একটি গুপ্ত পুস্তকে রয়েছে যাকে প্রকৃতির বিধান

বলে। অর্থাৎ কুরআনের সমস্ত শিক্ষার সাক্ষ্য প্রাকৃতিক বিধানের প্রতিটি অণু-পরমাণু দ্বারা প্রমাণ হয়। এর শিক্ষা ও এর কল্যাণসমূহ কল্প-কাহিনী না যা মুছে যাবে, বরং যে একে বুঝবে এবং পালন করবে সে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিও অর্জন করবে। কিন্তু এ-ও স্মরণ রাখা উচিত যে, এর রহস্যাবলী, এর গভীরতা পবিত্র ব্যক্তিদের জন্যই প্রকাশিত হয়। এর জন্য পবিত্র লোকদের সান্নিধ্য হতে কল্যাণমণ্ডিত হবার প্রয়োজন রয়েছে। এ যুগে এমন ব্যক্তিত্ব একমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই। তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত জ্ঞানের কল্যাণে যা বর্ণনা করেছেন তা আমাদের দেখা উচিত, অভিনিবেশ করা উচিত আর সেই তফসীরই রয়েছে যা তাঁর (আ.) জ্ঞান অনুযায়ী আহমদীয়া জামা'তের সাহিত্যে বিদ্যমান।

পবিত্র কুরআনের নাম 'যিক্র' কেন রাখা হয়েছে– এই বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআনের নাম যিক্র রাখা হয়েছে কেননা সেটি মানুষের আভ্যন্তরীণ বিধানকে স্মরণ করায়। এরপর তিনি (আ.) বলেন, কুরআন কোনো নতুন শিক্ষা নিয়ে আসে নি বরং সেই আভ্যন্তরীণ বিধানকে স্মরণ করায় যা মানুষের মাঝে বিভিন্ন শক্তিরূপে অন্তর্নিহিত করা হয়েছে। যেমন ধৈর্য্য, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, বলপ্রয়োগ, ক্রোধ, স্বল্পেতুষ্টি ইত্যাদি। মোটকথা যে প্রকৃতি অন্তর্নিহিত রাখা হয়েছে পবিত্র কুরআন সেটি স্মরণ করিয়েছে। যেমন فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিধানে সুপ্ত পুস্তক, যেটি প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না– সেটা স্মরণ করিয়েছে। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের পবিত্র কুরআন পাঠ করা উচিত। পবিত্র কুরআন মানুষের যে প্রকৃতিগত সামর্থ্য রয়েছে সেগুলোকে সঠিক প্রকৃতির পানে পথপ্রদর্শন করে। তাই সে সত্যিকার প্রকৃতি যার থেকে বর্তমান যুগে বিশেষভাবে মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে, পবিত্র কুরআন তা সবিস্তারে বর্ণনা করে। আর এ থেকে দূরে সরে যাবার কারণেই আমরা দেখতে পাই, বর্তমান যুগে কিছু অনৈতিক এবং অপ্রাকৃতিক বিধান তৈরি করার প্রবণতা সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষ সেটি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা পবিত্র কুরআনে গভীর মনোনিবেশ কর, অভিনিবেশ কর। এর ওপর আমল করা তোমাদেরকে মানব প্রকৃতির উন্নত মানদণ্ড দেখাবে। তাই এদিকে মনোযোগ দেয়া জরুরি এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের কুরআন পাঠ করা উচিত এবং বুঝা উচিত। স্বাধীনতার নামে বর্তমানে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদেরও মন-মস্তিষ্ককে যেভাবে বিষিয়ে তোলা হচ্ছে, এর থেকেও আমরা বাঁচতে পারব। অনেক পিতা-মাতা প্রশ্ন করে, বাচ্চারা স্কুল থেকে যা শিখে আসে কীভাবে সেগুলোর উত্তর দিব? (এর উত্তর হলো) যদি আমরা চিন্তা করি, তফসীর পড়ি, জামা'তের সাহিত্য পাঠ করি যা পবিত্র কুরআনের আদেশাবলীর আলোকেই করা হয়েছে– তাহলে সন্তানদের প্রশ্নের উত্তরও পিতা-মাতা দিতে পারবেন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, একইভাবে এই গ্রন্থের নাম যিক্র রাখা হয়েছে; যদি এটি পাঠ করা হয় তাহলে তা আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহকে এবং সেই আত্মিক জ্যোতি যা মানুষের মাঝে খোদার পক্ষ থেকে সৃষ্ট– তা স্মরণ করাতে পারে। মোটকথা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনকে অবতীর্ণ করে স্বয়ং এক আধ্যাত্মিক নিদর্শন দেখিয়েছেন। (বারংবার পাঠ করলে এটি তোমাদের স্মরণ করাতে থাকবে।) যেন মানুষ সেসব তত্ত্বজ্ঞান, সত্য ও আধ্যাত্মিক অলৌকিক নিদর্শনসমূহ জানতে

পারে যা তার জানা ছিল না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কুরআনের এই চূড়ান্ত লক্ষ্য যা হলো هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (মুত্তাকীদের হিদায়াত দেয়া)– সেটি বাদ দিয়ে একে শুধুমাত্র কিছু কিচ্ছাকাহিনীর সমাহার মনে করা হয় এবং অত্যন্ত ভ্রূক্ষেপহীনভাবে ও স্বার্থপরতার সাথে আরবের মুশরিকদের মতো একে أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (পূর্ববর্তীদের কাহিনী) আখ্যা দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া হয়। তিনি (আ.) বলেন, সেই যুগটি ছিল মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের ও কুরআন অবতীর্ণ হবার যুগ, যখন (কুরআন) পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া সত্যসমূহকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এসেছিল। এখন সেই যুগ এসে গেছে যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মানুষ কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী থেকে নীচে নামবে না। এটিই আমরা দেখতে পাচ্ছি! অসংখ্য ক্বারী রয়েছে, অসংখ্য কুরআন পাঠকারী রয়েছে, কিন্তু আমল করার বেলায় নেই! সুতরাং তোমরা এখন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ, মানুষ কতটা সুললিত কণ্ঠে, সুন্দর কিরাআতে কুরআন পড়ে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে পৌঁছে না; একটুও পালন করে না। এজন্য পবিত্র কুরআন, যার আরেকটি নাম হলো 'যিক্‌র' বা স্মরণিকা, যা সেই প্রাথমিক যুগে মানুষের মাঝে প্রচ্ছন্ন ও বিস্মৃত সত্য এবং অন্তর্নিহিত শক্তিবৃত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এসেছিল, আল্লাহ্ তা'লার সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি- إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (আমরাই এর সুরক্ষা বিধান করব) অনুসারে এই যুগেও ঊর্ধ্বলোক থেকে একজন শিক্ষক এসেছেন যিনি وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ -এর বিকাশস্থল ও প্রতিশ্রুত ব্যক্তি। আর তিনিই সেই (প্রতিশ্রুত ব্যক্তি) যিনি তোমাদের মাঝে (দাঁড়িয়ে) কথা বলছেন। [তিনি নিজের প্রতি ইঙ্গিত করে একথা বলেছেন। হায়! মুসলমানরা যদি বিবেকবুদ্ধি খাটাতো এবং যেই ব্যক্তিকে খোদা তা'লা প্রেরণ করেছেন তাঁর কথা শুনতো, নিজেদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিতো, যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য করতো, মুসলমানদের সার্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করতো, কেবল ফতোয়াবাজি করে ইসলামকে দুর্নাম না করতো, পবিত্র কুরআনের গূঢ়তত্ত্ব বুঝতো! যাহোক, আহমদীদের সর্বদা আত্মবিশ্লেষণে রত থাকা উচিত যে, আমরা কতটা পবিত্র কুরআনের শিক্ষার তাৎপর্য অনুধাবন করার ও তদনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করছি বা পালন করছি।

পবিত্র কুরআন প্রকৃত জ্ঞানের সাথে পরিচিত করাতে চায়– এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা যেমন এটা চান যে, মানুষ তাঁকে ভয় করুক, তেমনিভাবে তিনি এ-ও চান যে, মানুষের মাঝে জ্ঞানের আলো সৃষ্টি হোক। শুধু ভয় নয়, বরং জ্ঞানের আলোও যেন সৃষ্টি হয় এবং এর মাধ্যমে যেন তারা ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের ধাপসমূহ অতিক্রম করে। কেন? যেন তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি হয়, চিন্তাভাবনা করার সুযোগ হয়। কেননা প্রকৃত জ্ঞানের সাথে পরিচয় একদিকে যেমন সত্যিকার খোদাভীতি সৃষ্টি করে, অন্যদিকে এসব জ্ঞানের ফলে খোদার ইবাদতের স্পৃহা জাগ্রত হয়। একজন মুমিন যখন এভাবে চিন্তা করে, প্রণিধান করে, পবিত্র কুরআনের মাঝে মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং পার্থিব যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় রয়েছে সেগুলোকেও পবিত্র কুরআনের আলোকে যাচাই করে তখন তত্ত্বজ্ঞানও সৃষ্টি হয়, খোদাভীতিও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এমন কিছু দুর্ভাগাও রয়েছে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিমগ্ন হয়ে গিয়ে নিয়তি বা তকদীর থেকে দূরে চলে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ

করে বসে। আর কিছু মানুষ ভাগ্য ও নিয়তিকে স্বীকার করতে গিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করে বসে। একদিকে একদল জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে খোদা তা'লাকে ভুলে যায়, অপর দল আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হবার নামে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ভয় পায় ও একে পরিত্যাগ করে আর বলে, এগুলো ভুল; কিন্তু পবিত্র কুরআন উভয় শিক্ষাই দিয়েছে এবং পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে। পবিত্র কুরআন প্রকৃত জ্ঞানের সাথে এজন্য পরিচিত করাতে চায় এবং এজন্য এদিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে কারণ এর মাধ্যমে খোদাভীতি সৃষ্টি হয় এবং খোদা তা'লাকে চেনার ক্ষেত্রে যত বেশি উন্নতি হতে থাকে ততটাই ক্রমান্বয়ে খোদা তা'লার মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা (হৃদয়ে) সৃষ্টি হতে থাকে। আর মানুষকে তকদীরের অধীনে থাকার শিক্ষা এজন্য প্রদান করে যেন আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় বিশ্বাস ও আস্থার বৈশিষ্ট্য তার মাঝে সৃষ্টি হয় এবং যেন সে তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত হয়ে সেই প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি অর্জন করে যা নাজাত বা পরিত্রাণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃত জ্ঞানের উৎস ও উৎপত্তিস্থল কুরআন মজীদে এই উম্মতকে দান করেছেন। যে ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত এই গুঢ়তত্ত্ব ও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে আর সেই জ্ঞান লাভ করে যা কেবলমাত্র প্রকৃত তাকওয়া ও খোদাভীতির মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে, সে সেই জ্ঞান অর্জন করে যা তাকে বনী ইসরাঈলী নবীদের সদৃশ করে দেয়। হ্যাঁ, এই কথা একেবারে সত্য, এক ব্যক্তিকে যে অস্ত্র দেয়া হয়েছে সে যদি সেই অস্ত্র ব্যবহার না করে, তবে এটা সেই অস্ত্রের অপরাধ নয় বরং তার নিজের দোষ। বর্তমানে বিশ্বে এই অবস্থাই বিরাজ করছে। মুসলমানরা তাদের কাছে কুরআন শরীফের মতো এরকম অতুলনীয় নেয়ামত থাকা সত্ত্বেও যা তাদেরকে সবরকম পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দিতে পারতো ও সকল অমানিশা থেকে বের করতে পারতো– এটিকে পরিত্যাগ করেছে আর এর পবিত্র শিক্ষার কোন ধারই ধারে নি। ফলাফল হলো, তারা ইসলাম থেকে বহুদূরে ছিটকে পড়েছে।

সুতরাং যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, মুসলমানরা কুরআন করীমের মহান শিক্ষা থেকে বহুদূরে ছিটকে পড়ে কেবল নামসর্বস্ব মুসলমান রয়ে গেছে। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষের সাক্ষাৎকার সম্বলিত কিছু সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান অথবা ভিডিও ক্লিপ মানুষ দিয়ে থাকে। এগুলো দেখলে বুঝা যায়, তাদের ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও ইতিহাস সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। শুধুমাত্র মোল্লা-মৌলভীদের কথায় রসূলের সম্মানের নামে অথবা কুরআন বা সাহাবীদের (অবমাননার) নামে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশ থেকে আমাকে একজন লিখে পাঠিয়েছেন, যখন আক্রমণকারীদের দল এসে যখন হামলা করে, তখন তাদের মাঝে এক ছেলে সম্ভবত পাথর ছুঁড়ে মারছিল। আমাদের এই আহমদী সদস্য তাকে বলেন, তুমি কী করছ? এটা কি কুরআনের শিক্ষা বা ইসলাম কি এই শিক্ষা দেয়? আমাকে বলো, কোথায় আছে এই শিক্ষা? আমরা তো কলেমা পাঠকারী। সেই ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তার হাতের পাথর নিচে ফেলে দেয়। সুতরাং মোল্লা-মৌলভী তাদেরকে যেভাবে উস্কে দেয়, তারা সেই অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দেয়।

আল্লাহ্ তা'লা এই অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট থেকে আমাদের নিরাপদ রাখুন এবং আমাদের সৌভাগ্য দিন যেন আমরা এই রমযানেও ও এর পরেও কুরআন করীমকে বুঝি, শিখি এবং এর বিধিনিষেধের ওপর আমল করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পৃথিবীর পাপ-পঙ্কিলতা থেকেও নিরাপদ রাখুন। রমযানে দোয়া করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন; আমি পূর্বেও এই বিষয়ে বলেছি। আল্লাহ্ তা'লা সর্বত্র প্রত্যেক আহমদীকে সবরকম অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন, আর আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে যারা সংশোধনের অযোগ্য তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নিদর্শনে পরিণত করুন যেন অন্যরা (তাদের দেখে) আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধের ওপর আমলকারী হতে পারে। সার্বিকভাবে পৃথিবীর জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে যুদ্ধের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। এদের মাঝে সর্বপ্রথম আমাদের একজন মুরব্বী ও মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ যিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে নিজের ওয়াকফের দায়িত্ব পালন করেছেন। নিতান্তই বিনয়ী মানুষ ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি জামা'তের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন এবং তিনি সেবা করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তার নাম মুনাওয়ার আহমদ খুরশীদ সাহেব; তিনি পশ্চিম আফ্রিকায় জামাতের মুরব্বী হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তাঁর বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় ১৯০৩ সালে তাঁর দাদা হযরত মিয়া আব্দুল করীম সাহেবের মাধ্যমে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন করম দীনের মামলার শুনানির জন্য জেহলামে গিয়েছিলেন সেই সময় তিনি বয়আত করেন। মৌলভী খুরশীদ সাহেবের পিতামাতার ঘরে যেই সন্তানই জন্ম নিত সে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করতো। যখন তার (খুরশীদ সাহেবের) জন্ম হয় তখন তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েন। আরোগ্যের কোনো উপায় চোখে পড়ছিল না। এমতাবস্থায় তার দাদা মিয়া আব্দুল করীম সাহেব যিনি একজন সাহাবী ছিলেন, এই সিদ্ধান্ত নেন যে, এই সন্তানকে খোদার পথে উৎসর্গ করা হোক। তিনি এর কারণস্বরূপ বলেন, আল্লাহ্‌র প্রয়োজন থাকলে তিনি নিজেই তাকে বাঁচাবেন। যাহোক, এমন সময় গ্রামে একজন ডাক্তার আসেন যিনি দূরবর্তী কোন গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন; তিনি তার চিকিৎসা করেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে অলৌকিকভাবে আরোগ্য দান করেন। তার শ্বশুর মুহাম্মদ খান দরবেশ সাহেবও তাকে নিয়ে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। (স্বপ্নটি হলো) তিনি একটি খুব উঁচু ও উজ্জ্বল মিনারে রয়েছেন, আর এই দরবেশ সাহেবকে বলা হয়েছিল, আহমদীয়াতের মিনারটিকে তিনি খুব উজ্জ্বল করে তুলবেন এবং আহমদীয়াতের অনেক সেবা করবেন; আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে সুযোগও দিয়েছেন। জামেয়া থেকে পাশ করার পর তিনি কিছুদিন পাকিস্তানে অবস্থান করেন। এরপর ১৯৮৩ সালে তিনি আফ্রিকার গাম্বিয়ায় চলে যান। এছাড়া সেনেগাল ও এখানকার অন্যান্য দেশেও দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। গাম্বিয়াতে তিনি আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। পরে অসুস্থতার কারণে ২০০৫ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে চলে আসেন, কিন্তু এখান থেকেও তিনি সেনেগালে মুরব্বী যাওয়া ও রীতিমত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সেনেগাল জামা'তের ব্যবস্থাপনা চালাতে থাকেন। এই সময়কালে, অর্থাৎ ২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত তিনি ইউকে জামেয়াতে শিক্ষক হিসাবেও দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান। যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন দারুণ কাজ করেছেন। তিনি অনেকগুলো

বয়আত করানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। ৪০ জন সংসদ সদস্য তাঁর মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন আর তার এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর জলসা সালানার ভাষণে 'সেনেগাল বিজয়ী' উপাধীতে তাঁকে ভূষিত করেন। ১৫ জন সংসদ সদস্যকে তিনি জার্মানির জলসা সালানায় নিয়ে আসেন। এছাড়া বিভিন্ন মুরব্বীর জন্য যে PAMA অ্যাওয়ার্ড স্কীমের অধীনে তিনি 'আব্দুর রহীম নাইয়্যার' পুরস্কার প্রাপ্ত হন। আমার নির্দেশে তিনি স্পেনেও যেতেন, সেখানে বসবাসকারী আফ্রিকানদের মাঝে তবলীগ করেছেন আর খুব ভালো কাজ করেছেন। সেখানে অনেকগুলো বয়আত হয়েছে। আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থার অধীনে অনলাইনে কুরআন শিক্ষার ক্লাসও নিতেন, আমৃত্যু তিনি এ কাজ অব্যাহত রাখেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি ৩ ছেলে, ৩ মেয়ে ও স্ত্রী রেখে গেছেন। তাঁর এক ছেলে এখানে যুক্তরাজ্যে মুরব্বী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কানাডা জামেয়ার বর্তমান অধ্যক্ষ দাউদ হানিফ সাহেব তখন গাম্বিয়ার আমীর ছিলেন যখন তিনি আফ্রিকা যান । তিনি বলেন, ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এবং একজন মুবাল্লেগের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি স্কুলে ইসলামিয়াতও পড়াতেন। তিনি বলেন, সেনেগালে তবলীগ করা খুবই কঠিন ছিল। তিনি বলেন, ১৯৮৫ সালের শেষে তাকে সেনেগালের সীমান্তে অবস্থিত ফ্রাফিনি শহরে বদলী করা হয়। উদ্দ্যেশ ছিল এখানে অবস্থান করে সেনেগালে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সফল করা। এটি খুব কঠিন একটি কাজ ছিল। সেনেগাল সরকার কোনো পাকিস্তানিকে ভিসা দিত না। কিন্তু মৌলভী মুনাওয়ার খুরশীদ সাহেবের মাঝে এই যোগ্যতা ছিলেন যে, তিনি মানুষের সাথে মিলেমিশে যেতেন এবং খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারতেন। তিনি কিছুটা ফরাসি ভাষাও জানতেন। এ কারণে যখন তাকে সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয় তখন তিনি শীঘ্রই সীমান্তে নিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন, এরপর সেই সম্পর্কের সুবাদে তিনি সেনেগালে আসাযাওয়া আরম্ভ করেন। সেখানকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে তিনি স্ট্যাণ্ডার্ড ফরাসি ভাষা শিখতে থাকেন। কেননা সেখানকার স্থানীয় অফিসারদের কাছ থেকে তিনি এ অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন যে, আমি এখানে প্রধান শিক্ষক আবদুস সালাম বারী সাহেবের কাছে বসে ফরাসি ভাষা শিখব। যাহোক, এটি একটি সফলতা ছিল আর এভাবে তিনি কিছুদিন পরপর সেনেগাল যেতে থাকেন। এছাড়া বিশেষ ধরনের একটি পাস ছিল, তা তিনি পেয়ে যান। এর মাধ্যমে গাম্বিয়ার গাড়িতে বসে সেনেগাল যাওয়া যেতো। গাড়িতে করে তিনি (জামা'তের) বইপুস্তক নিয়ে যেতেন এবং তবলীগ করতেন আর এভাবে তিনি অনেকগুলো বয়আত করান। 'কালিক' রিজিয়নে পূর্ব থেকেই কিছু আহমদী ছিল। সেখানকার একজন স্থানীয় মুবাল্লেগ হামেদ আম্বাই সাহেবের সাথে মিলে তিনি কাজ করেন, ফলে সেখানে জামা'ত আরো বিস্তৃতি লাভ করে। সেখানে রাস্তাঘাট ছিল না। আফ্রিকাতে রাস্তাঘাট ভাঙ্গাচোরা অথবা কাঁচা রাস্তা হয়ে থাকে। আবার অনেক স্থানে রাস্তাঘাটই নেই। দূরবর্তী বিভিন্ন এলাকায় তিনি মোটরসাইকেল নিয়ে চলে যেতেন। মোটরসাইকেলের রাস্তাও পায়ে হাঁটা সরু পথ ছিল আর এসব পথে ঝোপঝাড় এত কাছে থাকত যে, (মোটরসাইকেলে যাতায়াতের সময়) তার পা রক্তাক্ত হয়ে যেত। কিন্তু এসবের প্রতি কখনোই তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। বরং তিনি নিজের কাজে মগ্ন থাকতেন।

দাউদ হানিফ সাহেব লিখেন, প্রথম দিকে এটি অনেক কঠিন কাজ ছিল। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তবলীগ করতাম। এরপর ধীরে ধীরে যখন সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং জামা'তের পরিচিত ছড়িয়ে পড়ে আর তিনি যখন মানুষের কাছে একথা পৌঁছাতে আরম্ভ করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য এসেছেন এবং কর্মকর্তদের নিকটও যখন এ বার্তা পৌঁছাতে থাকেন, তখন বেশ স্বাধীনভাবেই তিনি সেনেগালে যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন। তিনি নিয়মিত পরিদর্শনে যেতেন। এভাবে 'কালিক' অঞ্চলের অধিকাংশ জনপদে আহমদীয়াতের বিস্তার ঘটে। অনেকগুলো জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি মোটরসাইকেলের উল্লেখ করেছি, কিন্তু কোনো কোনো স্থান এমন ছিল যেখানে মোটরসাইকেলও পাওয়া যেত না। সেখানে গরুগাড়ি বা গাধার গাড়িতে করে তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন আর বিভিন্ন গ্রামে যেতেন।

বর্তমানের কয়েকজন মুবাল্লিগ লিখেছেন, আমরা সেখানে গেলে সেখানকার লোকেরা বলেছে, অনেক আগে মুনাওয়ার খুরশীদ সাহেব আমাদের এখানে আসতেন। অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি আসতেন। তিনি সেখানে গিয়ে থাকতেন এবং তবলীগ করতেন। সেখানকার লোকদের সাথে রাতও কাটাতেন। তাদের খাবার, অর্থাৎ সিদ্ধ চেরী অথবা বাজরা খেয়ে পানি খেয়ে নিতেন, এটিই তার খাদ্য ছিল। আর এরপর তিনি তবলীগ করতে করতে সামনে (অন্য অঞ্চলে) চলে যেতেন। কখনোই তিনি এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নি যে, থাকার ভালো ব্যবস্থা আছে কি না, খাবার পাওয়া যাবে কি না। যেখানেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সেখানেই তিনি রাত কাটিয়েছেন, খাবার যা পেয়েছেন তা-ই খেয়েছেন। এভাবে তিনি সকলের প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। তিনি তবলীগও খুব ভালোভাবে করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন স্বপ্ন দেখেন যে, ফরাসি ভাষাভাষী দেশগুলোতে জামা'ত উন্নতি লাভ করছে তখন তিনি যে রিজিয়নে ছিলেন সেখান থেকে বেরিয়ে সেনেগালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাকে সেখানে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে প্রভাবশালী লোকদের তবলীগ করেন। সেখানকার সংসদ সদস্যদের তিনি তবলীগ করেন, ফলে ১৪ জন সংসদ সদস্য বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করে। জামা'তের ওপর এর ভালো প্রভাব পড়ে এবং সেখানকার জামা'তও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। নেযামে জামা'ত তথা জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে দৃঢ় করার জন্য মোয়াল্লেমদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি তালীম, তরবীয়ত ও ট্রেনিং-এর প্রয়োজন ছিল। এ প্রোগ্রাম তিনি বাৎসরিক ভিত্তিতে চালিয়ে গেছেন। মওলানা সাহেব অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এ কাজ সম্পন্ন করেন। ১৯৯৭ সনে তাকে সেনেগালের আমীর নিযুক্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে পালন করেন। তিনি (দাউদ হানিফ সাহেব) লিখেন, যুগ-খলীফার আনুগত্য তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল। আমি বাস্তবেই তাঁর মাঝে এটি দেখেছি। অসুস্থ হয়ে এখানে আসেন, ১০ বছর যাবৎ তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় তাকে কোনো কাজ দেয়া হলে তিনি তা তাৎক্ষণিকভাবে করার চেষ্টা করতেন। তবলীগ করার প্রতি অনেক আগ্রহ ছিল।

সেনেগালের মুবাল্লিগ ওজিহুল্লাহ্ সাহেব বলেন, এখানে আসার পর আমি মুনাওয়ার সাহেবের নাম অনেক শুনেছি। এছাড়া আমি যেখানেই যেতাম সেখানকার মানুষ তাঁর কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতো।

স্থানীয় মুয়াল্লিম সাহেবগণ বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একজন স্থানীয় মুয়াল্লিম মাহমুদু তাফসীর মারা সাহেব বলেন, মুনাওয়ার খুরশীদ সাহেবের মাধ্যমে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি আর তিনি আমাকে ভালোভাবে প্রশিক্ষিত করেছেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম ও ভালোবাসার সাথে আমার তরবিয়ত করেছেন যার ফলে আমি জামেয়া আহমদীয়া ঘানায় শিক্ষার্জন করেছি আর এভাবে জামা'তের খেদমত করার সুযোগ পেয়েছি। তিনি বলেন, আমি সুদীর্ঘকাল তার সাহচর্যে কাটিয়েছি। তিনি লিখেন, ইনি সেনেগালিয়ান। খিলাফতের সাথে তাঁর প্রেমময় ভালবাসার সম্পর্ক ছিল আর তিনি আমাকে এ বিষয়েরই নসীহত করে বলতেন যে, খিলাফতের সাথে সম্পর্ক রাখবে। তিনি বলেন, দ্বিতীয়ত আমি তার মাঝে লক্ষ করেছি যে, তিনি কখনো তাহাজ্জুদ বাদ দেন নি আর আমাদেরকেও তিনি সবসময় উপদেশ দিয়ে বলতেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড় আর তাহাজ্জুদে বিশেষভাবে খলীফাতুল মসীহ্‌র জন্য দোয়া করো। মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, তিনি খুবই মুত্তাকী ব্যক্তি ছিলেন, পরিশ্রমী ছিলেন, পুরো সেনেগালে তিনি জামাতী সফর করেছেন। তিনি সর্বদা প্রতিটি গ্রামে গিয়ে মুহাম্মদী মসীহ্‌র বাণী পৌঁছানোর চেষ্টা করতেন। তিনি বলেন, আমি এ বিষয়ের সাক্ষী যে, মুনাওয়ার সাহেব যখন জামাতী কাজে ব্যস্ত থাকতেন তখন দিনরাত বা পানাহারের কোন পরোয়াই করতেন না। খোদা তা'লার সাথেও খুব নৈকট্যের সম্পর্ক ছিল, অধিকাংশ সময় তা দেখতাম। তিনি বলেন, একবার কোন এক জামাতী অনুষ্ঠান ছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে লোকজন এসেছিল। জনৈক আহমদী সেখানে অসুস্থ হয়ে গেলে ফেরত চলে যেতে চান। তিনি তাকে (ফিরে যাবার) অনুমতি দেন। বাসে জায়গাও পেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে যখন বাসে বসানো হচ্ছিল তখন মুনাওয়ার সাহেব একথা বলে যেতে বারণ করেন যে, আপনি এই বাসে বসবেন না, অন্য বাসে বসুন। তিনি বলেন, আমি ভাবলাম যে এই বাস কোন দুর্ঘটনায় পতিত হবে আর যদি এমনই হয় তাহলে মানুষ বলবে, দেখ! জামাতের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল, সেখানে গিয়ে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। যাহোক পরবর্তীতে তা-ই ঘটে অর্থাৎ যে বাসে যেতে বারণ করেছিলেন সেই বাস দুর্ঘটনার শিকার হয়। সেই ব্যক্তি অন্য একটি বাসে বসে নিরাপদে নিজ ঘরে পৌঁছে যান। এর মাধ্যমেও মানুষের ঈমান অনেক বৃদ্ধি পায়। মানুষের মাঝে তার প্রতি যে ভালোবাসা ছিল তা এথেকে বুঝা যায় যে, সেনেগালে বিভিন্ন স্থানে তার গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়েছে, বিপুল সংখ্যায় অ-আহমদীরাও এতে অংশগ্রহণ করে।

ফাটেক জামা'তের প্রেসিডেন্ট ওগান ফাই সাহেব বলেন, মুনাওয়ার খুরশীদ সাহেব আত্মনিবেদনের যে প্রেরণা নিয়ে কাজ করতেন অন্য কারো পক্ষে এমনটি করা খুবই কঠিন।

এরপর স্থানীয় মুয়াল্লিম জালু সাহেব বলেন, প্রথমবার যখন তিনি সেনেগাল এসেছেন তখন দীর্ঘদিন মুনাওয়ার সাহেবের সাথে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি খুবই মুত্তাকী এবং সাহসী ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ ছিলেন। জামাতী সফরের সময় তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার সাথে তবলীগি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতেন। একইভাবে তিনি ন্যায়পরায়ণও ছিলেন। জামাতের সদস্যদের সাথে তিনি খুবই আন্তরিক ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতেন।

রাজা বুরহান সাহেব বলেন, জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন আর দৈনিক তার ডায়ালাইসিস করতে হতো। একদিন কোনো এক বিয়ের অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন,

আমি দোকান খুলে ফেলেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দোকান খোলার অর্থ কী? উত্তরে তিনি বলেন, এখন তো ঘরেই থাকি তাই আমি ঘরের বাইরে টেবিল লাগিয়ে গরমের সময় পানি রেখে দিই, সাথে বই-পুস্তকও রেখে দিই আর এভাবে পথচারীদের পানির প্রয়োজন হলে তাদেরকে পানিও পান করাই আর বই-পুস্তকও দিয়ে দিই। এভাবে তিনি অবসর বসে থাকেন নি, এই অসুস্থাবস্থাতেও (তবলীগের) নতুন পথ বের করে নিয়েছেন। তাই সেই সমস্ত লোক যারা বলে যে, তবলীগ কীভাবে করবো! তবলীগ করার পথ যদি সন্ধান করা হয় তাহলে অবশ্যই পথ পাওয়া যায় এজন্য শুধু উদ্দীপনা থাকা চাই, আগ্রহ চাই।

এরপর, মুনাওয়ার খুরশীদ সাহেবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি খুব দ্রুত ভাষা শিখে ফেলতেন। গাম্বিয়াতেও বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার রয়েছে আর তিনি বিভিন্ন ভাষা জানতেন আর তিনি বলতেন, আমাদের তিন জন গাম্বিয়ান মুবাল্লিগ আব্দুল্লাহ্ সাহেব, আব্দুর রহমান সাহেব এবং মুহাম্মদ মুবায়ে সাহেব যারা এখান থেকে পড়াশুনা করে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, এরা তিনজন পৃথক পৃথক গোত্রের লোক। এরা একে অন্যের ভাষা বুঝতে পারে না। কিন্তু আমি এ তিন গোত্রের ভাষাই জানি। তার স্ত্রী নুসরত জাহান সাহেবা বলেন, সন্তানদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে তিনি অনেক যত্নবান ছিলেন। খুবই স্নেহশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। খিলাফতের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল। ওয়াকফের দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করেছেন। বিরোধ দূর করার ও সন্ধি করার সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টা করতেন। খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। আফ্রিকায় জামাতী সফরে গেলে আমাদেরকে বলে যেতেন, আমি কখন ফিরব তা নিয়ে তোমরা চিন্তা করবে না। যখন কাজ শেষ হবে ঘরে ফেরত আসব। তবলীগ-পাগল লোক ছিলেন। স্পেনেও তিনি তবলীগের অনেক সুযোগ পেয়েছেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সেখানে যেতেন। এভাবে তিনি পুরনোদের সাথে যোগাযোগ বহাল করেছেন। তার ছেলে মুহাম্মদ আহমদ খুরশীদ জামাতের মুরব্বী। তিনি বলেন, তিনি সর্বদা আমাদেরকে এ উপদেশ দিতেন, লোকদের উপকার করা উচিৎ। কেননা এটিও একটি সুন্দর ইবাদত, এতে খোদা সন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, আমি তার মধ্যে সর্বদা ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখেছি।

স্পেনের সালমান সালমী সাহেব বলেন, স্পেনে অবস্থানকালে কয়েকবার তার সাথে তবলীগের কাজে বের হবার সুযোগ হয়। বিস্ময়কর বিষয় আমি বার বার দেখেছি, তিনি কোনো (আফ্রিকান) পথচারীকে সালাম দিতেন এবং নিমিষেই তাকে বশ করে ফেলতেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সাথে একটি দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যেত। একই সাথে তিনি বলতেন, সে ওমুক গ্রামের অধিবাসী এবং তার আশেপাশে অমুক অমুক এলাকা রয়েছে। সেখানে আমি গিয়েছি এবং সে অঞ্চলের মানুষ খুবই আন্তরিক। সেখানকার প্রভাবশালী লোকদেরও চিনতেন। যেহেতু আফ্রিকান ভাষায় কথা বলতেন, এজন্য ঐ ব্যক্তিও তার কথা শুনত আর অবাকও হতো আবার খুশীও হত, আর দু'তিন সাক্ষাতের পর সে জামাতের কাছে এসে যেত, এরপর তাকে [আহমদীয়াতের] বাণী পৌঁছাতেন। তিনি বলেন, প্রথম পরিচয়েই বাণী পৌঁছাতেন না। প্রথমে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়তেন, এরপর দ্বিতীয় বা তৃতীয় সাক্ষাতে তবলীগ করতেন এবং আহমদীয়াতের সংবাদ দিতেন। তিনি বলেন, তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সৎ স্বভাবের কল্যাণে ততক্ষণে (তবলীগের) ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যেত, তখন লোকেরা শীঘ্র বয়াতও করতো।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি স্পেনে অনেক কাজ করেছেন। সেখানে তিনি জামা'তও প্রতিষ্ঠা করেছেন। আহমদীয়াত ও প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছানোর একটি উন্মাদনা ছিল তার মাঝে। এটিও সত্য যে, একই সাথে তার মাঝে পরম বিনয়ও বিদ্যমান ছিল। আমি যখন তাকে স্পেনে যেতে বলেছি তখন অসুস্থতা সত্ত্বেও কোন ওজর-আপত্তি না করে সেখানে যেতে প্রস্তুত হয়ে যান।

আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে এমন বিশ্বস্ত মুবাল্লেগ ও মুরব্বী দান করতে থাকুন যারা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবে, পূর্ণরূপে দায়িত্ব পালনকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

আরেকটি জানাযা হচ্ছে মুরব্বী সিলসিলা জনাব ইকবাল আহমদ মুনীর সাহেবের যিনি চৌধুরী মুনীর আহমদ সাহেবের পুত্র। তিনি পাকিস্তানে ছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে তিনিও মৃত্যু বরণ করেছেন। তার বংশেও আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল ১৮৯৫ সালে তার দাদা চৌধুরী গোলাম হায়দার সাহেবের মাধ্যমে। তিনি ১৯৮৩ সালে জামেয়াতে শিক্ষা সমাপনান্তে কেন্দ্রীয় ইসলাহ ও ইরশাদ দপ্তরের অধীনে কাজ করেন। অতঃপর ২০০১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সিয়েরালিওনে ছিলেন। এরপর ফেরত চলে আসেন। এরপর পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলাতে কাজ করতে থাকেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কঠোর পরিশ্রমের সাথে কাজ করতেন। আল্লাহ্‌র ফযলে তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রচিত্তে জামাতের কাজ করতেন। মানুষের সাথে খুবই সু-সম্পর্ক রাখতেন এবং নিষ্ঠাবান প্রকৃতির ছিলেন। মরহুমের স্ত্রী ও তিন ছেলে সন্তান রয়েছে।

মুরুব্বী সিলসিলাহ্ আব্দুল ওয়াকিল সাহেব বলেন, তিনি সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, খিলাফতের সাথে ঐকান্তিক ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন কিন্তু হৃদয়ের দিক থেকে খুবই নরম প্রকৃতির ছিলেন। ক্ষণিকের সাক্ষাতেই বুঝা যেত যে, তার বিনয় কত উঁচু মানের।

করাচির নায়েব আমীর সৈয়দ মুনীর আহমদ সাহেব তার সাথে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, অত্যন্ত পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। যে কাজই দেয়া হতো তাৎক্ষণিকভাবে সে কাজকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতেন। নিয়মিত দফতরে এসে সঠিক পরামর্শও প্রদান করতেন। তিনি বলেন, তার কারণে আমিও নিজের মাঝে সাহস পেতাম। খুবই স্বচ্ছ চিন্তাভাবনার মানুষ ছিলেন। নিজ অঞ্চলের লোকদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল যার কারণে তার কাজে সহজসাধ্যতা তৈরি হয়ে যেত। আর একারণেই চাঁদার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাকেই বলা হতো এবং যখন তিনি চাঁদার ব্যাপারে বলতেন তখন মানুষের হৃদয়ে তার কথার প্রভাবও পড়ত। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তাঁর মর্যাদা উন্নত করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ সৈয়্যদা নুসরাত জাহাঁ বেগম সাহেবার। তিনি মরহুম দরবেশ আব্দুল আযীম সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনিও মৃত্যু বরণ করেন। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। দরবেশী যুগে উড়িষ্যা প্রদেশ থেকে বিয়ের সুবাদে আগমনকারী প্রথম মহিলা ছিলেন। মরহুমা দরবেশীর যুগে তার স্বামীর সাথে একান্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে কাটিয়েছেন। নিয়মিত নামায রোযা পালনকারী, দোয়াকারী, পুণ্যবতী ও নিষ্ঠাবান মহিলা ছিলেন। নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং অন্যদেরও কুরআন করীম শেখাতেন। অনেক বাচ্চা ও মহিলাকে কুরআন করীম পড়া

শিখিয়েছেন। দরবেশীর যুগে যখন আয়-রোজগার কম ছিল তখন জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যের দিকে তাকিয়ে না থেকে মুরগী পালন করতেন। জনসেবার প্রতি গভীর প্রেরণা রাখতেন। কাদিয়ানে মহিলাদের দাফন-কাফনে অনেক খেদমত করেছেন। লাশ গোসল দেয়ার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করতেন। যুগ-খলীফার সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। প্রতিটি তাহরীকে অংশগ্রহণ করতেন। মরহুমা ওসীয়্যতকারিনী ছিলেন। তিনি চার ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। খুরশীদ আনোয়ার সাহেবের সৎ মা ছিলেন। ইনি আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাসবিদ দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেবের চাচি ছিলেন।

আল্লাহ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, মর্যাদায় উন্নীত করুন। নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)